স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শনে নারীমুক্তি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী

মুর্শিদা রহমান*

Abstract: Swami Vivekananda (1863-1902) was an influential philosopher, educator, and social thinker. He worked for women's freedom and equality along with education. He said that education is not just about gathering information but making people aware of their own dignity and responsibility. The aim of education is the perfection of our life which is the matter of our hearts. His educational thought deserves special praise. Because his contribution to education was immense. His educational thought was developed based on his philosophy of life, awakened conscience, and social meditation concepts. According to him, true education is the development of the fullness of man's inner being. In his philosophy of education, he gave his own views on women's education and the education of marginalized groups. According to Swamiji if women can be empowered through education, they will be able to solve their own problems. It can be said that the development of a nation depends on educating its people. It includes the progress of women. Because men and women are like two wings of a bird. Regarding the education of the marginalized people, he said that if the poor people cannot be reached by education, then the education should reach the poor. He further said that the spread of public education is the root of all progress. He mentioned the mother tongue as the best medium of mass education. This paper analyzes Vivekananda's views on women's education and the education of marginalized communities.

ভূমিকা

উনিশ শতকের মানবতাবাদী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় চিন্তাজগতে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। কারণ ভারতীয় চিন্তাজগতে তিনি বিভিন্ন দিকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। বিশেষ করে আধুনিক চিন্তাধারায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি অবিভক্ত বাংলার এমন একজন মহামানব– যিনি নিজস্ব যুক্তিপদ্ধতি, মৌলিকচিন্তা, সৃজনশীলতা ও মননশীলতার মাধ্যমে শিক্ষা, দর্শন, ধর্ম ও ইতিহাসের বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রেমের বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এছাড়াও স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক যুগে হিন্দু ধর্মের বিশ্বব্যাপী পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছিলেন। বিবেকানন্দ মননশীলতার মাধ্যমে নিজেকে আলোকিত করার পাশাপাশি সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে শিক্ষাদর্শনে তাঁর অবদান অন্যতম। শিক্ষায় জাতীয় চেতনার আলোড়ন সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের ধারাবাহিকতা ছিল অপরিসীম। তাঁর শিক্ষার ব্যাপ্তি সমগ্র মানব জাতিকে নিয়ে। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর গভীর চিন্তা নব্য ভারতের গঠনমূলক কাজে বিশেষ অবদান রেখেছিল। শিক্ষাদর্শনে বিশেষ করে নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বামীজীর অবদান ছিল অপরিসীম। কেননা তিনি নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা সম্পর্কে যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন। তাঁর মতে জ্ঞান মানুষের অন্তরের জিনিস। জ্ঞান বাইরে থেকে

* প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আসেনা। বরং বিশ্বপ্রকৃতির জ্ঞানের ভাণ্ডার হলো মানুষের 'মন' যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত কিছু সঞ্চিত থাকে। অর্থাৎ শিক্ষা তাই যা মানবপ্রকৃতির অজ্ঞানআবরণ উন্মোচন করে তার পূর্ণতা বিকাশে সহায়ক হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার আদর্শকে দেখতে চেষ্টা করলে বুঝা যায় যে, স্বামীজীর শিক্ষা সম্পর্কীয় মত ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র কিছু নয় বরং তিনি ছিলেন ভারতের শাশ্বত আধ্যাত্মিকতার পুনরুজ্জীবনের অন্যতম নায়ক। তাঁর যে আধ্যাত্মিকতা ছিল তা বাস্তব সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র কোন ঘটনা নয়। বরং ভারতবাসীকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে বিদেশী শাসন শোষণের হাত থেকে রক্ষা করাই ছিল তাঁর আধ্যাত্যিকতার মর্মবাণী। স্বামীজীর ভিতরকার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল শিক্ষার মাধ্যম। তিনি কথা-বার্তায়, পুস্তক-পুস্তিকায়, পত্র-পত্রিকায় ভারতবাসীর মুক্তির জন্য যেসব কথা বলেছিলেন সেগুলোই ছিল তাঁর মৌলিক শিক্ষাচিন্তা। তাঁর শিক্ষা চিন্তা ও কর্মে জাতীয় চেতনার উদ্বোধনের ক্ষেত্রে যেসব আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলোর স্রোত আজ পর্যন্ত স্তব্ধ হয়নি এবং ভবিষ্যতেও সেই স্রোত অব্যাহত থাকবে। কারণ বিশ শতকের শুরুর পরিবেশ পরিস্থিতিতে শিক্ষায় যে ভাবধারার প্রয়োজন ছিল তা বিশ শতকের শেষে আরও প্রকট রূপ লাভ করেছিল। তাই তিনি দারিদ্র্য মানবসন্তানকে ডেকে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন যে- 'তোমরা অমৃতের সন্তান, তোমরা দরিদ্র নারায়ণ'। আর এই কথার মধ্যে তিনি বুঝালেন যে, মানুষকে সেবা মানেই ঈশ্বর সেবা। অর্থাৎ- 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বরসত্তা প্রচ্ছন্ন বা সুপ্ত অবস্থায় প্রতিটি মানুষের মাঝেই আছে যেটাকে জাগাতে হবে। আর এটি জাগানোর প্রক্রিয়াকেই স্বামীজী তাঁর শিক্ষাদর্শনের মূল বিষয়বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি মনুষ্যত্বের শিক্ষার কথা সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছিলেন।তিনি তাঁর শিক্ষাদর্শনে নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। কারণ নারীশিক্ষা ও জনশিক্ষা বিষয়ে স্বামীজীর চিন্তা ছিল সুদূর প্রসারী। নারীদের স্বাবলম্বী শিক্ষায় শিক্ষিত করার পক্ষে তিনি কাজ করেছিলেন। আর জনশিক্ষা বিষয়ে তাঁর মত ছিল দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছাতে না পারে তবে শিক্ষাকেই দরিদ্রদের গৃহে বা কর্মস্থলে নিয়ে যেতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী সন্ন্যাসী। স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২ খ্রি.) পূর্বনাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। 'বাবা মা তাঁকে আদর করে 'বিলে' নামে ডাকতেন। এই 'বিলে' নামের শিশুটিই ভারতবর্ষের পরম আশীর্বাদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কেননা তিনি ভারতীয় চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন নিজস্ব চিন্তাচেতনা ও মৌলিক লেখনী দ্বারা। ছেলেবেলা থেকেই বালক নরেন্দ্রনাথের মধ্যে স্বাধীন মনোভাব, সাহস, মেধা, বন্ধুপ্রীতিসহ বিভিন্ন হৃদয়বত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে আধ্যাত্মিক তৃষ্ণাও ছিল (বিশ্বশ্রয়ানন্দ, ১৯৯১, পৃ. ৩)। প্রতিদিন রাতের বেলা নিদ্রার পূর্বে জ্যোতিদর্শন ছিল তাঁর স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা। নরেন্দ্রনাথের সন্ন্যাসী হবার সাধ ছিল আবাল্য থেকেই। তাইতো তিনি একবার রামায়ণ কথকথা শুনে সীতা ও রামের মূর্তি কিনে এনে বন্ধু হরির সাথে চিলেকোঠায় ধ্যানে বসেছিলেন। ছোটবেলায় তাঁর সত্য ভাষণ ও নির্ভীক আচরণে স্কুলের শিক্ষকরাও বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন। স্কুল পড়ুয়া বালক বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি শরীরচর্চায়ও যত্নবান ছিলেন (অমৃতত্বানন্দ, ১৯৮১, পৃ. ১১)। স্কুল জীবনে তিনি ভালো বক্তা হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ছাত্রজীবনে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্য প্রভৃত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, দর্শন ও ধর্ম উভয়েরই লক্ষ্য এক, তবে এদের প্রয়োগপদ্ধতি ছিল ভিন্ন। কারণ যুক্তিনির্ভর ও বিচারকেন্দ্রিক বিষয় হলো দর্শন, আর ধর্ম হলো বিশ্বাস ও ভক্তি (ইসলাম, ২০১১, পৃ. ১৫১)। দর্শনশাস্ত্রে নরেন্দ্রনাথের ছিল অসাধারণ জ্ঞান। ছাত্রজীবনে দর্শনশাস্ত্রের ক্লাসে শিক্ষক (স্যার উইলিয়াম হেস্টি) মহোদয় অত্যধিক চিন্তাভাবনা করলে কী অবস্থার সৃষ্টি হয় তা বুঝাতে গিয়ে অতীন্দ্রিয় অবস্থাকে বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলেন। আর তখন এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই

বিবেকানন্দ তাঁর ভবিষ্যৎ পথস্রষ্টা রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে পরিচিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৬-১৮৮৬) ছিলেন উনিশ শতকের মহাজ্ঞানী মহাপুরুষদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যিনি ধর্মকে মানবকল্যাণের উৎস হিসেবে দেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কোনো সুযোগ না পেলেও তিনি ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে আপামর জনসাধারণের শিক্ষাগুরু, মানবপ্রেম ও ঐক্যের পথিকৃৎ। তাঁকে প্রাচীন গ্রিসের দার্শনিক সক্রেটিসের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, কোনো গ্রন্থ-প্রবন্ধ রচনা না করে এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে জ্ঞানগুরু সক্রেটিস যেমন মুখে মুখে, পথে-ঘাটে আবাল-বৃদ্ধ বনিতাকে দার্শনিক, নৈতিক ও মানবিক শিক্ষা দিয়েছিলেন তারই সার্থক লিপিবদ্ধ রূপ লক্ষ করা যায় সক্রেটিসের শিষ্য মহামতি দার্শনিক প্লেটোর অমর গ্রন্থাবলিতে। ঠিক তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণের অনানুষ্ঠানিক মৌখিক শিক্ষার আনুষ্ঠানিক রূপ প্রদান এবং বিশ্বময় তা প্রচার করেছিলেন তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (ইসলাম, ২০১১, পৃ. ১৫১)। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে অবলীলাক্রমে সক্রেটিস ও প্লেটোর সম্পর্কের সাদৃশ্যের বিষয়টি চলে আসে। স্বামী বিবেকানন্দ কর্মে যেমন ছিলেন সুদৃঢ় ও নমনীয়, তেমনই তাঁর হৃদয়ে স্রোতস্বিনীর মতো প্রবাহিত হতো দিব্যপ্রেমের ফল্গুধারা। তাঁর মধ্যে উচ্চ বাসনার আদর্শ ছোটবেলা থেকেই বীজাকারে সুপ্ত ছিল। তরুণ বয়সেই তাঁর মধ্যে ছিল আধ্যাত্মিকতার প্রতি প্রবল অনুরাগ। নিজ জীবনে তিনি অনেক সাধক-মনীষীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে ঈশ্বরের সাকার ও নিরাকার দুটি রূপই সত্যবলে মন্তব্য করেছিলেন। এছাড়াও তিনি বলেন যে, প্রতিটি আত্মাই স্বর্গীয় অর্থাৎ সকলেই অনন্ত শক্তির আধাঁর। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বমানবতাবাদ ভাবনা পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেলের পূর্ণতাবাদেরই প্রতিধ্বনি। হেগেলের পূর্ণতাবাদের মূল কথা 'মানুষ হও'(be a person). আর মানুষ হওয়া মানে হলো নিজের মধ্যকার কুপ্রবৃত্তিসমূহকে দমন করে আত্মপ্রসারতা এবং সকলের সঙ্গে একাত্মতার উপলব্ধি। এর মাধ্যমে ব্যক্তির যথার্থ ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে এবং আত্মোপলব্ধি হয়। এছাড়াও হেগেলের পূর্ণতাবাদ অনুসারে মানুষ তার নিজের মধ্যকার ইন্দ্রিয়বৃত্তি, স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিক জীবন পরিহার করে বৃহত্তর ও মহৎ জীবনের অধিকারী হয়। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি রামকৃষ্ণের উপদেশ ছিল সর্বজনীন মানবপ্রেমের প্রকৃষ্ট নিদর্শন 'তুই হবি বিরাট বটবৃক্ষের মতো। শত সহস্র যোজন বিস্তৃত হবে তোর শাখা প্রশাখা'। সংসারে যারা দুঃখপীড়িত, দুর্বল, ব্যথিত, আর্ত তারা এসে তোর জীবন মহীরূহের স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় পাবে, শান্তি পাবে নিজেদের আত্মবিশ্বাসে জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার শক্তি লাভ করবে। সর্বোতভাবে উৎসর্গীকৃত হবে তোর জীবন (দাশগুপ্ত, পৃ. ৩০১)। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই মূর্ত রূপ লাভ করেছে :

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর (দাশগুপ্ত, পৃ. ৩০৫) ।

অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'অগ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশি। ঈশ্বরতত্ব যদি খোঁজ মানুষে খুঁজবে। মানুষের ভিতর নারায়ণ, দেহটি আবরণ যেন লন্ঠনের ভিতর আলো জ্বলছে' (সেনগুপ্ত, পৃ. ২০৫)। মানব সেবাই ঈশ্বর সেবা। স্বামী বিবেকানন্দের কল্যাণকামী আদর্শ ভারতের শিক্ষা, দর্শন, ধর্ম, চরিত্রগঠন এবং বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। স্বামীজী মূলত মানুষকে নিয়ে কাজ করেছেন এবং মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ঐক্য-সংহতি, ধর্মীয় উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদির মাধ্যমে সম্প্রীতিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর সামগ্রিক কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রেখেছিলেন মানবসেবার মহান ব্রত নিয়ে। তাঁর শিক্ষাদর্শনে সৃষ্টির সেবা যে মুখ্য বিষয় ছিল তা ফুটে উঠেছিল। তিনি সকল ধর্মের সারনির্যাসকে আত্মস্থ ও ধারণ করে যে বলিষ্ঠ বাণী প্রচার করেছিলেন তা হলো ক্ষুধার্ত

মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো হলো সেই মানুষকে অপমানের শামিল। স্বামীজী সম্পর্কে শ্রী অরবিন্দ বলেছেন–'মাতৃভূমির জাগ্রত আত্মায় বিবেকানন্দ এখনও জাগ্রত। ভারতমাতার সন্তানগণের হৃদয়ে বিবেকানন্দ অদ্যাপি অধিষ্ঠিত' (ঘোষ, ১৪২০)।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা সম্বন্ধে যে গভীর চিন্তাপ্রসূত বক্তব্য দিয়েছিলেন তা নব্যভারতের গঠনমূলক কার্যে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে শিক্ষাদর্শন বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি দিক। তাঁর শিক্ষাপ্রসূত চিন্তা বালক-বালিকাগণের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতিবিধানে সহায়ক ছিল। কেননা শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর তথ্যপূর্ণ বাণীসমূহ ছিল খুবই তাৎপযপূর্ণ। বিবেকানন্দ শিক্ষার সংজ্ঞার্থের ক্ষেত্রে বলেছেন– "Education is the manifestation of perfection that is already in man." (বিবেকানন্দ, ২০১৪, পৃ. ০১) অর্থাৎ মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পূর্ণত্বের বিকাশই হলো শিক্ষা। এ প্রসঙ্গে বলা যায় প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে তাই যা মানব প্রকৃতির অজ্ঞানআবরণ উন্মোচন করে তার পূর্ণতা বিকাশে সহায়ক হয়। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্বামীজীর শিক্ষাসম্বন্ধনীয় আদর্শকে দেখলে বুঝা যায়, এটা আধ্যাত্মিক আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র কিছু নয়। বরং যে মানুষ ঈশ্বরের সন্তান সেই মানুষের অভ্যন্তরীণ সত্তা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ কীভাবে সম্ভব-এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার উপর্যুক্ত সংজ্ঞায় বলেছেন। তিনি মনুষ্যত্ব বিষয়ক শিক্ষার কথা সর্বাগ্রে বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন শিক্ষার চরম ও পরম উদ্দেশ্য হলো যে বৃদ্ধি বা বিকাশের ফল হিসেবে ব্যক্তি মনুষ্যত্বের অধিকারী হবে সেই বৃদ্ধি বা বিকাশ (দেব ও সুলতানা, ২০২০, পৃ. ২৪)। অর্থাৎ বিবেকানন্দের মতে, শিক্ষাই শক্তি। প্রতিটি জাতির উন্নতির মূলে রয়েছে শিক্ষা। যে দেশ যত শিক্ষিত সেই দেশ সর্ববিষয়ে তত শক্তি সঞ্চয় করে জাতিসংঘে গৌরবাসন করতে সমর্থ হয় (দেব ও সুলতানা, ২০২০. পৃ. ২৪)। উনিশ শতকের পাশ্চাত্য শিক্ষার পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ে স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা সম্পর্কে উপরিউক্ত মত দিয়েছেন। স্বামীজী তাঁর শিক্ষাদর্শনে স্ত্রীশিক্ষা ও জনশিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি নারী শিক্ষা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছানোর ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তাছাড়া তিনি যোগ্য শিক্ষকদের পাশাপাশি যুবকদের উপর শিক্ষার বিস্তারের জন্য আস্থা রেখেছিলেন। যুবকদের মধ্যে অশেষ প্রাণশক্তি বিদ্যমান যা চরিত্র গঠনের মধ্যে দিয়ে যুবকরা কাজে লাগাতে পারবে। তিনি বলেন, "আমাদের যুবকগণকে প্রথমত সবল হইতে হবে। যুবকদের লক্ষ করে তিনি বলেছেন গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে...তোমাদের শরীর আর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা আরও ভালো বুঝবে" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪)। এছাড়াও যুবকরা যাতে বহির্বিশ্ব ভ্রমণ করে সে বিষয়েও তাদেরকে স্বামীজী উৎসাহ দিয়েছেন। কারণ, বহির্বিশ্ব শিক্ষা হলে বহির্বিজ্ঞান শিক্ষা জরুরি, একইসাথে বিভিন্ন শক্তি প্রক্রিয়াবদ্ধভাবে ব্যবহার করে কী প্রকারে উৎকৃষ্ট ফল বের করা যায় তাও শিক্ষা নেওয়া সমান প্রয়োজন (দেব ও সুলতানা, ২০২০, পৃ. ২৫)। আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে বিষয়টি তা হলো প্রাচীনকালে প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনো স্থান ছিল না। সেখানে শিক্ষকই সব কিছুর নিয়ন্তা ছিল। কিন্তু বিবেকানন্দ শিক্ষা যে শিক্ষক নির্ভর হবে এটা প্রত্যাশা করেননি। তাঁর মতে, শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ ও স্বাধীন। তাই তিনি বলেছেন-শিক্ষা হলো মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ। আর তাই তাঁকে বলতে শুনি– ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া, তাহাদের দরিদ্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া, আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া, অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এই পার্থক্য হইল? শিক্ষা–জবাব পাইলাম (বিবেকানন্দ, ২০১৪, পৃ. ০১)। অর্থাৎ, স্বামীজী দুর্দশাগ্রস্থ বঙ্গবাসী ও বঙ্গভূমির কথা চিন্তা করে এটা উপলব্ধি করলেন যে, এদেরকে ফেলে ঈশ্বরকে খোঁজা বৃথা। কেননা এরাই হলো জীবন্ত ঈশ্বর। তাঁর মতে, ঈশ্বরসেবা সম্ভব হয় মানুষকে সেবা করার মাধ্যমে। তিনি ধর্ম ও আধ্যাত্মিক চিন্তা ব্যতীত বিজ্ঞানের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। অর্থাৎ স্বামীজীর

শিক্ষাদর্শনে বিজ্ঞানের বিশেষ স্থান প্রাপ্তি হয়েছে। তাই তিনি বলেছেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না (জ্ঞানদ্বীপ, ১৯৯৭, পৃ. ৪)। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান ও ধর্ম বিবেকানন্দের শিক্ষাব্যবস্থার যৌথ ভিত্তি (লোকেশ্বরানন্দ, ১৯৯৬, পৃ. ৫২৫)। অর্থাৎ সার্বিকভাবে তিনি শরীরচর্চা, ধর্ম, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, চারুকলা, সাহিত্য-এসব পাঠ ও চর্চাকে শিক্ষার অংশ বলে তুলে ধরেছেন (লোকেশ্বরানন্দ, ১৯৯৬, পৃ.৫২৬)। মনুষ্যত্বের যথাযথ পরিচায়ক যে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনই নয় সেটা তিনি মনে করতেন এবং এই পুঁথিগত বিদ্যা মানুষের সত্যিকার চরিত্র গঠনের অন্তরায় এবং এটা মানুষের মধ্যে অহংবোধ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে স্বামীজী পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা অর্জন করার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষার মূল ভিত্তিই হচ্ছে শিক্ষকের সশ্রদ্ধ নিষ্ঠা, যা অনুসরণ করে শিক্ষার্থী তাদের মাঝে উন্নতমুখী অনুসন্ধিৎসা এবং আগ্রহ জাগাবে (সনাতনন্দ, ১৪০৯)। একজন শিক্ষক আদর্শবান হবেন এবং তাঁর আদর্শগুলোকে শিক্ষার্থীর সম্মুখে তুলে ধরবেন। শিক্ষার্থীকে চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলাই শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনের উপর দৃষ্টি দিতে হবে এবং চরিত্র গঠনের জন্য ধর্মচর্চা, সৎগ্রন্থ, শাস্ত্রপাঠ, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধাবোধ ও বিবেকবোধকে জাগ্রত করতে হবে। আবার, স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষাদান বা শিক্ষকতার প্রক্রিয়াটিকে একটি চারাগাছের সাথে তুলে ধরেছেন। একটি চারাগাছ যেমন নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে বড় হয় তেমনি একটি শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রেও বেশি কিছু করা যায় না। কারণ শিশুটি নিজেই নিজেকে শেখায়। এক্ষেত্রে শিশুকে শুধু তার নিজস্ব ধারায় বেড়ে ওঠার অনুকূলে সাহায্য করলেই হবে এবং শিশু যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলোকে অপসারিত করতে হবে। তিনি মনুষ্যত্বের শিক্ষা (Man-making education) বা প্রকৃত মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব এমন শিক্ষার কথা বলেছেন। তিনি বলেন যে জগতের অনন্ত পুস্তকাগার তোমারই মন। বহির্জগতে কেবল তোমার নিজের মনকে অধ্যয়ন করার উত্তেজক কারণ উপলক্ষ্য মাত্র, তোমার নিজ মনই সর্বদা তোমার অধ্যয়নের বিষয় (বিবেকানন্দ, ২০১৪, পৃ. ০২)। অগ্নি যেমন একখণ্ড চকমকিতে নিহিত থাকে, জ্ঞান তেমনই মনের মধ্যে নিহিত থাকে উদ্দীপক কারণটি যেন ঘর্ষণ, জ্ঞানাগ্নিকে প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ বলা যায় যে, 'প্রকৃতিতে কোন জ্ঞান নাই; সমস্ত জ্ঞান মানুষের আত্মা হতে আসে। মানুষ জ্ঞান প্রকাশ করে, তার অন্তরে আবিষ্কার করে–এই সবকিছু পূর্ব হতে অনন্তকাল যাবৎ রয়েছে' (বিবেকানন্দ, ২০১৪, পৃ. ০৩)। তিনি আরও বলেন যে, শিক্ষা শুধু কতকগুলি তথ্যের সমষ্টি নয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর মস্তিষ্ককে শিক্ষার নামে যদি তথ্যাভারে ভারাক্রান্ত করা হয় তাহলে সেগুলো বদহজম হয়ে শিক্ষার্থীর জীবনকে দুর্বিষহ ও সংকটাপন্ন করে তুলবে। তাই বলা যায় শিক্ষণ বিষয়টা এমন ইতিবাচক হবে যা ভাব বা ধারণা জীবন-গঠন, মানুষ তৈরি ও চরিত্রসাধনের অনুকূল হবে। স্বামীজী বলেছেন–"Education is not the amount of information that is put into your brain. We must have life building, character-making, assimilation of ideas" (রায়, ১৯৮৯, পৃ. ৭০৪). অর্থাৎ শিক্ষা আমাদের মস্তিষ্কে রাখা তথ্যের পরিমাণ নয়। বরং শিক্ষার মধ্যে অবশ্যই জীবন-নির্মাণ, মানব-দৃষ্টি ও চরিত্র নির্মাণের অঙ্গিকার থাকবে। আবার বলা যায় যে বৃদ্ধি বা বিকাশের ফল হিসেবে ব্যক্তি মনুষ্যত্বের অধিকারি হবে। সেই বৃদ্ধি বা বিকাশই হবে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য। তাইতো স্বামীজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন- "The end of all education, all training should be man-making. The end of aim of all training is to make the man grow" (রায়, ১৯৮৯, পৃ. ৭০৪-৭০৫). অর্থাৎ তার মতে, শিক্ষাটা এমন হবে যা দ্বারা মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটবে। বুদ্ধির সম্প্রসারণ হবে এবং মানুষ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে। তবে এক্ষেত্রে তিনি চলতি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন যে, "যে বিদ্যার উন্মেষে সাধারণের জীবন সংগ্রামে সামর্থ্য করিতে পারা যায় না, যাহাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থপরতার মানসিকতা বৃদ্ধি পায় না, তাহা কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারা যায়, তাহাই হইতেছে প্রকৃত শিক্ষা" (হালদার, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৬)। এক্ষেত্রে স্বামীজী শিক্ষিত তরুণদেরকে সচেতন করতে গিয়ে বলতেন যে, তোমরা ভাবছো-তোমরা শিক্ষিত। আসলে "তোমরা কি শিখেছো? কতকগুলি

পরের কথা মুখস্থ করে মাথায় পুরে, পাশ করে শিক্ষিত হওয়া যায়না।" তিনি শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে পদ্ধতি হিসেবে বিজ্ঞানভিত্তিক বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁর মতে, "একাগ্রতা" (Concentration)-ই হলো জ্ঞানার্জনের পরম পদ্ধতি। অর্থাৎ শিক্ষা লাভের মৌলিক পদ্ধতি হলো মনের একাগ্রতা। সাধারণ ব্যক্তি থেকে উচ্চতর যোগী পর্যন্ত সকলে যদি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য হিসেবে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহলে জ্ঞাতব্য বিষয় নিবিড়ভাবে আত্তীকরণ করতে পারবে। তাছাড়াও স্বামীজী বলেছেন, একাগ্রতার পার্থক্যের কারণেই মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য করা যায়। একাগ্রতা না থাকার কারণেই এক শ্রেণির জীব পশু। আবার প্রতিটি মানুষের মধ্যে একাগ্রতা মাত্রাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। একাগ্রতার ফলেই মন সংযত হয় এবং ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। শিক্ষালাভে চরিত্র গঠনের উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন স্বামীজী। চরিত্রের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন– "একটা মানুষের চরিত্র হলো তার সমগ্র প্রবণতার সমষ্টি, আর মনের সমুদয় ঝোঁকের যোগফল" (হালদার, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৭)। অর্থাৎ মানুষের আনন্দ-বেদনার ফলে মনের ধারণার উপর যে ভিন্ন ভিন্ন ছাপ হয় এই ছাপের সমগ্রতাকেই মানুষের চরিত্র বলে। আর কল্যাণকামী শিক্ষাব্যবস্থা চারিত্রিক দৃঢ়তার বিষয়ে মনোযোগী হয়। বিবেকানন্দের মতে, আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সকল ধরনের শিক্ষা জাতীয়ভাবে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি দেশের উন্নয়নের জন্য সকলকে প্রতি বছর জাপান ও চীনে যাবার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়ে বলেছেন, "দেখে এসো জাপানীরা সাহেবদের সব নিয়েছে, কিন্তু নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে জাপানীই আছে" (বিবেকানন্দ, ২০১৪, পৃ. ৫১)। তিনি শিক্ষকের প্রতি সশ্রদ্ধ নিষ্ঠা ও ভক্তি করার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষাকে বাজারের পণ্য সামগ্রীর মতো অনেকেই মনে করছেন। শিক্ষা কোনো পণ্য নয়। শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে বিবেচনার এই বিষয়গুলো শিক্ষকদের সমাজ থেকে দূর করতে হবে। বর্তমানে 'Touch and Pass' (স্পর্শ মাত্র উত্তীর্ণ) বা 'Sure Success' (অব্যর্থ সফলতা) সমাজে যেভাবে প্রচলিত সেটা সম্পূর্ণ নৈতিকতা বিরোধী। বরং শিক্ষা হলো individuality হতে personality তে উত্তরণের প্রক্রিয়া। সেজন্য বিবেকানন্দ জোর করে চাপানো শিক্ষাকেও অনর্থক মনে করেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা-দর্শনের সঙ্গে স্বামীজীর শিক্ষা-দর্শনের সাদৃশ্য রয়েছে। 'The Religion of Man' (১৯৩১) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নিজস্ব শিক্ষা দর্শন সম্পর্কে বলেছেন: "তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, বিশ্বসত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে (দেব, ২০১৭, পৃ. ১১৪)।" শিক্ষাসম্পর্কিত আলোচনায় বিবেকানন্দ বলেছেন আমাদের প্রচলিত যে শিক্ষাব্যবস্থা এটা (negative education) (বিবেকানন্দ, ২০১৪, পৃ. ৪৬) বা নেতিবাচক শিক্ষা। আর ইতিবাচক শিক্ষা বা (positive education) বলতে তিনি বুঝিয়েছেন যে, শিক্ষার্থী তার ইচ্ছামতো শিক্ষা গ্রহণ করবে এক্ষেত্রে তার উপর কোন জোরজবরদস্তি করা যাবে না। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, বিবেকানন্দের বা ইতিবাচক শিক্ষা প্রকৃতিবাদী দার্শনিক রুশোর শিক্ষা সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গেও সাদৃশ্যপূর্ণ।

নারীমুক্তি সম্পর্কে বিবেকানন্দ

নারীশিক্ষার বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ছিল সুদূরপ্রসারী। নারীশিক্ষার বিস্তার সাধনের মাধ্যমে নারীমুক্তির ক্ষেত্রে স্বামীজীর অসামান্য অবদান পরিলক্ষিত হয়। তাঁর মতে, নারী ও পুরুষ দুটি সম্মিলিত শক্তির প্রয়াসে একটি দেশ সমৃদ্ধি ও উন্নতি অর্জন করতে পারে। অর্থাৎ, পৃথিবীর যে সকল জাতি শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন হয়েছে তারা নারী জাতিকে শ্রদ্ধা করেই শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করেছে। কোনো দেশ বা জাতিই নারীকে অবজ্ঞা করে উন্নতি বা পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। যে দেশ বা জাতি নারীজাতিকে শ্রদ্ধা করে না তারা কখনও বড় হয়নি ভবিষ্যতেও হবে না। যে দেশে বা পরিবারে নারীরা দুঃখের মধ্যে বাস করে এবং যেখানে নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা নেই সেই দেশ বা পরিবারের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই শক্তিরূপিনী নারীর প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে হবে এবং নারীদের স্বাবলম্বী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। নারীদের উন্নত, শিক্ষিত, স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে চাইলে নারীদেরকে

শ্রদ্ধা করে তাদের সাথে কাম্য আচরণ করতে হবে। উন্নত দেশ আমেরিকাতে পুরুষরা নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করে। তাই তারা শিক্ষিত, স্বাধীন ও শক্তিশালী। ভারতেও নারীদের শ্রদ্ধার আসনে বসানো হতো। তাইতো সংস্কৃত বিভিন্ন সাহিত্যে নারীদের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে । কিন্তু যখন পুরোহিতরা নারীদের বেদপাঠ থেকে বঞ্চিত করা শুরু করলেন তখন থেকেই নারীর প্রতি অশ্রদ্ধা শুরু হয়। 'মনু নারীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলেন', 'যেখানে স্ত্রী লোকেরা খুশি সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহা কৃপা' (হালদার, ১৯৯৩, পৃ. ১৪১)। নারীদের বা স্ত্রীদের অসংখ্য সমস্যা আমাদের সমাজে বিদ্যমান আর এই সব সমস্যার সমাধান একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব। মনুসিংহতায় বলা হয়েছে যে, "পুরুষদের শিক্ষার জন্য যতটুকু যত্ন নেওয়া প্রয়োজন মেয়েদের শিক্ষার জন্য ঠিক ততটুকু পৃষ্ঠপোষকতা করা ও যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।" পুত্রগণ যেভাবে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করে নারীদেরকেও এটা পালন করতে অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং শিক্ষালাভে নিয়োজিত করতে হবে।সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারতীয় নারীদের ব্যথা, বেদনা, দুঃখ ও দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে নারীশিক্ষা, নারীমুক্তির জন্য দেশবাসীকে সজাগ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল স্বামীজী নারীশক্তির বিকাশকে দেশের অগ্রগতির অন্যতম সোপান বলেছেন এবং সমাজে নারীর অবমূল্যায়নের জন্য অশিক্ষাকে দায়ী করেছেন। নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য স্বামীজীর অবদান হলো-গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন, ব্রহ্মচারিণী দল গঠন, নারীমঠ স্থাপন, পাঠক্রম তৈরি, বেলুড় মঠ স্থাপনের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন নারীদের সুশিক্ষিত করে তুলতে হলে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। ব্রহ্মচারিণী দল গঠন করতে হবে যারা মেয়েদের শিক্ষা দিবে কীভাবে মেয়েরা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মিটিয়ে ফেলতে পারে। নারীমঠ যেসব অঞ্চলে হবে সেইখানে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় ধরনের শিক্ষাদানের ব্যবস্থার কথা বলেছেন। নারীশিক্ষার পাঠক্রমের মধ্যে ধর্মশাস্ত্র , বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, দর্শন, সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সেলাই, রান্না পরিচর্যাসহ সকল বিষয়ে শিক্ষালাভের কথা বলেছেন। এইরকম শিক্ষা পেলে নারীরা তাদের নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারবে। নারীশিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে স্বামীজী নারীদের ধর্মশিক্ষার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের ধর্ম বাধা দেয় না। বরং নারীশিক্ষার বিষয়বস্তু হবে ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন ও পবিত্রতা রক্ষা। অর্থাৎ শিক্ষার বিস্তার ও জ্ঞানের উন্মেষের ওপর যেমন একটা দেশের উন্নতি নির্ভর করে তেমনি সাধারণের ভেতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হলে কিছু হবার জো নেই (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১৩৭১, পৃ. ২৮-২৯)। ...মেয়েদেরকে শিক্ষা দিতে হবে এবং তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে। আদর্শ চরিত্র প্রসঙ্গে স্বামীজী সীতার চরিত্রকে আদর্শ নারী চরিত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ নারীচরিত্রের যত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে সীতা তাদের আদর্শ এবং সীতা হতেই সকল চরিত্র উদ্ভব। তাঁর মতে, 'ভারতীয় নারীদেরকে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিজেদের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ' (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১৩৭১, পৃ. ১৪৯)। নারীদের অনেক গুরুতর সমস্যা রয়েছে। আর এসব সমস্যা সমাধানের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার কথা বলেছেন। তিনি জাগতিক ও আধ্যাত্মিক দুইদিকের গুরুত্বকেই প্রাধান্য দিয়ে নারীশিক্ষার জন্য একটা পরিকল্পনা দিয়েছেন। তাঁর মতে, শিক্ষা বলতে কেবল কতকগুলো শব্দ শেখা নয় বরং আমাদের বৃত্তিগুলোর শক্তিসমূহের বিকাশই হলো শিক্ষা। এই শিক্ষা দ্বারা ব্যক্তি নিজেকে এমনভাবে গড়ে তুলবে যেন এতে তার সমস্ত ইচ্ছার বিষয় জীবিত হয় ও সফল হয়। আর এই শিক্ষায় নারীদেরকে শিক্ষিত করতে পারলে ভারতের কল্যাণসাধনে নির্ভীক মহিয়সী নারীর অভ্যুদয় হবে এবং নারীমুক্তি সম্ভব হবে । এই নারীরা সঙ্ঘমিতা, লীলাবতী, অহল্যাবাঈ ও মীরাবাঈ এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বার্থশূন্য বীররমণী হবেন। নারীরা নিজেদেরকে শিক্ষিত করে এমন যোগ্যতা অর্জন করবে যেন তারা নিজেরা নিজেদের সকল সমস্যা মীমাংসা করতে পারে এবং তারা নিজেরাই যাতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা বলতে পারে। অর্থাৎ নারীদের শিক্ষাটা এমন হবে যেন তাদের গঠন হয়, মনের শান্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয় এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। এতে

করে নারীদের মধ্যে বীরত্বের ভাবটা জন্ম নেয় (বিবেকানন্দ, ২০২২, পৃ. ৫১)। স্বামীজী নারী শিক্ষার জন্য প্রথমত একদল ব্রহ্মচারিণীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন যারা নারীশিক্ষার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করবেন। নারীশিক্ষার বিস্তারের জন্য তারা গ্রামে ও শহরে শিক্ষাকেন্দ্র খুলবে। শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে নারীদের ধর্ম অর্থাৎ জপ, তপ, পূজা, ধ্যান, শিল্প, বিজ্ঞান, কলা, পুরাণ, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীর পালনসহ সর্বোপরি চরিত্র গঠনের শিক্ষা দিতে হবে। তাছাড়াও শক্তি ও বীরত্বের অনুশীলন হবে শিক্ষার অঙ্গ এবং স্ত্রী শিক্ষার প্রচার করতে হবে ধর্মকে কেন্দ্র করে। কেননা ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন, ব্রহ্মচর্যব্রত উদযাপনের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। অর্থাৎ ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীরপালন এসব বিষয়ের মর্মগুলিই মেয়েদের শেখানো উচিত। নভেল-নাটক ছুঁতে দেওয়া উচিত নয়। তাই 'কেবল পূজাপদ্ধতি শেখালেই হবে না; সব বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে (বিবেকানন্দ, ২০১৪, পৃ. ৯৭)।' স্বামীজী উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও নারীদের আত্মরক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার ব্যপারে গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ, বীরত্বের ভাবটাও শিখতে হবে। নারীশিক্ষার ব্যাপারে তিনি সর্বোপরি বলেছেন শুধু বই পড়ে শিক্ষা না নিয়ে বরং এমন শিক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত হতে হবে, যে শিক্ষায় Character form (চরিত্র তৈরি) হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয় এবং নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে। নারীদের এভাবে শিক্ষা দিলে অর্থাৎ মেয়েরা মানুষ হলে তাদের ছেলে-মেয়েদের দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে এবং বিদ্যা, জ্ঞান, ভক্তি, শক্তি দেশে জেগে উঠবে। অর্থাৎ, স্বামীজী শিক্ষার ব্যাপারে পুরুষ ও নারী উভয়কেই একই কথা বলেছেন তা হলো : ভারত এবং ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধ, ভারতে জন্ম বলে লজ্জিত না হয়ে বরং গৌরব অনুভব কর (বিবেকানন্দ, ২০১৪)। বিবেকানন্দের যাপিত জীবনে দুর্গাপূজা পালন উপলক্ষে নারী-পুরুষ সমদৃষ্টির ভাবটি লক্ষ করা যায়। তাছাড়াও বিবেকানন্দ মেয়েদের শিক্ষালাভের জন্য বেলুড়ে একটি মঠ স্থাপনের কথা বলেছিলেন যা বর্তমানে 'সারদা মঠ' নামে পরিচিত। এই মঠে মেয়েরা অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, সেবামূলক ব্রত পালনের মাধ্যমে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে পারে। স্বামীজী নারীদের জন্য পৃথক মিশনের কথা বলেছিলেন আদর্শ নারী গঠনের উদ্দেশ্য। আর পৃথক মিশনে নারীই শিক্ষার্থী, নারীই শিক্ষিকা, নারীই পরিচালক। নারীশিক্ষার জন্য স্বামীজী নারীদেরকে নিজেদের মতো করে শিক্ষা গ্রহণের কথা বলেছেন যেখানে পুরুষের কোনো সংস্রব থাকবে না। তাঁর এই মঠে শুধু বিজ্ঞান, ধর্ম ও সাহিত্যই পড়ানো হয় না বরং গৃহকর্মের যাবতীয় কাজ শেখানো হয়। এই স্ত্রীমঠগুলোর প্রধান উদ্দেশ্যই হলো নারী শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে নারীকে তার স্বাধীকার ফিরিয়ে দেওয়া। যার মাধ্যমে নারীমুক্তি সম্ভব। স্বামীজীর নারীমঠ গুলোতে নারীশিক্ষায় তাদের ব্যবহারিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। তিনি নারীদের জন্য যে পৃথক মিশনের কথা বলেছিলেন সেখানে স্বামীজীর বিভিন্ন চিন্তাপ্রসূত শিক্ষা চালু আছে। তিনি আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে সীতা ও সারদা দেবীর চারিত্রিক দিককে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। নারীরা এই মিশনে ব্রহ্মচারিণী বা সন্ন্যাসিনী হিসেবে যোগদান করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ব্রহ্মচারিণী বা সন্ন্যাসিনী হিসেবে যোগদান করার জন্য মাস্টার্স ডিগ্রি বাধ্যতামূলক ও তাদেরকে সব ডিগ্রিতে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হতে হবে। কারণ পরবর্তীকালে তারা মঠগুলোতে বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজে নিজেদেরকে নিযুক্ত রাখবে। স্বামীজীর আদর্শের মঠগুলো বাংলাদেশে না থাকলেও অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও সুইজারল্যান্ডে আছে। আর ভারতের কলকাতার দক্ষিণেশ্বরে 'সারদা মঠ' প্রতিষ্ঠিত আছে। নারীদের এই মিশনগুলো সকল নারীদের উন্নয়নের কথা চিন্তা করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।(স্বামী অম্বেশানন্দ, সাক্ষাৎকার). স্বামীজীর শিক্ষাপ্রসূত নারীমুক্তির উক্ত ধারণাগুলো বর্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ বিবেকানন্দ তাঁর শিক্ষাদর্শনে যে ধারণাগুলো দিয়ে গেছেন তারই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে বর্তমানে 'দূর শিক্ষা কার্যক্রম'' 'নাইট স্কুল', 'উপ–আনুষ্ঠানিক শিক্ষা' ও 'উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' শিক্ষা কার্যক্রমগুলো চালু আছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নামক দুটি যুগ্ম প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ, ভারতসহ সমগ্র বিশ্বে প্রায় দু'শটি কেন্দ্রের মাধ্যমে মানবকল্যাণমী কর্ম পরিচালনা করছে।বিবেকানন্দ তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষা- দর্শনের দ্বারা একটি আদর্শ

শিক্ষাব্যবস্থার পথ নির্দেশ করে গেছেন যা বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োগ করলে ফলপ্রসূ হবে এবং নারীমুক্তি ঘটবে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা সম্পর্কে

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা দর্শনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা জনশিক্ষার বিষয়টি লক্ষণীয়। স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতের মানুষের যথার্থ শিক্ষা ব্যবস্থা হলো জনশিক্ষা। শিক্ষাকে মুষ্টিমেয় জনগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এবং সমাজের বৃহত্তর শ্রেণির মানুষকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখে কোন দেশ, জাতি, বা সমাজ সফল হতে পারে না। তাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনসাধরণের মধ্যে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাঁর মতে জনগণকে সুশিক্ষিত করতে না পারলে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। স্বামীজী মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে জনশিক্ষার ফলেই নতুন ভারতের জন্ম হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, একটা দেশের উন্নতি নির্ভর করে সাধারণ জনগণের উন্নতির উপর। স্বদেশের দুঃখে জর্জরিত দারিদ্র্য ও নিপীড়িত জনগণের জন্য তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের হাজার হাজার দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমগ্ন মানুষের এই অবস্থার জন্য শিক্ষিতদেরকেই দায়ী করেছেন। এক্ষেত্রে স্বামীজী বলেছেন শিক্ষিতরাই বিশ্বাসঘাতক, তারা অধঃপতিতদের উদ্ধার করার জন্য কোনো চেষ্টা করেননি। তিনি সাধারণ জনগণকে অবহেলা করার বিষয়টি জাতীয় পাপ হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং এদের অবহেলা করাটাই নিজেদের পতনের প্রধান কারণ বলেছেন। তিনি সাধারণ জনগণকে সুশিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষাচিন্তায় জনশিক্ষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। জনশিক্ষার ফলে যে নতুন ভারতের জন্ম হবে একথা স্বামীজী মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। জনশিক্ষা বিষয়ে বিবেকানন্দ মনে করেন যে, 'বঙ্গদেশের অনেক ছেলে-মেয়ে অল্প বয়স থেকেই দরিদ্রের কারণে উপার্জন কর্মের সাথে নিজেকে যুক্ত করে ফেলে। একারণে তাদের পক্ষে স্কুলে উপস্থিত হয়ে শিক্ষা গ্রহণ আর হয়ে উঠে না। এক্ষেত্রে স্বামীজীর মত হলো, দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছাতে না পারে, তবে শিক্ষাকেই দারিদ্র্যের গৃহে বা কর্মস্থলে যেতে হবে (দেব, ২০১৭, পৃ. ১১৭-১১৮)। 'কারণ একটা জাতির অগ্রসরের মূলে রয়েছে শিক্ষা। তাই শিক্ষা ও বুদ্ধির প্রসার যত ঘটবে একটি জাতি তত এগিয়ে যাবে। তবে মুষ্টিমেয়ের মধ্যে যদি শিক্ষাকে সীমিত করে রাখা হয় তাহলে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তাই জনগণকে জাগাতে হলে তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। জনসাধারণের মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। তথাকথিত নিম্নশ্রেণির মধ্যে শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো সম্ভব হলে তাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মোচিত হবে এবং তারাই তাদের মুক্তির পথ নির্ধারণ করতে পারবে। সুতরাং আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হলো তাদের চেতনার রাজ্যে জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো। 'দূর শিক্ষা কার্যক্রম''নাইট স্কুল', ' উপ -আনুষ্ঠানিক শিক্ষা' ও 'উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' সহ বর্তমানে আমাদের দেশে যে সমস্ত শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে এই ধারণা স্বামীজী বহু পূর্বেই তাঁর শিক্ষা দর্শনে দিয়ে গেছেন। সুতরাং তিনি 'জনশিক্ষাকেই' অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন, যেখানে অতীত হতে ছিন্ন হবার হওয়ার কোন শঙ্কা নেই, তেমনি বন্ধ হওয়ারও দুশ্চিন্তা নেই (দেব, ২০১৭, পৃ. ১১৮)। কারণ তাঁর শিক্ষাদর্শনে বিজ্ঞান ও কর্মে, কর্মে ও উপাসনায়, যুক্তি ও বিশ্বাসে কোনো বিরোধিতা নেই। স্বামীজী যখন ইউরোপের বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করেছিলেন তখন সেখানেকার সাধারণ মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আরামপ্রদ জীবনযাত্রা লক্ষ করেছিলেন। তিনি ঐ সময় তাঁর স্বদেশের মানুষের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে চোখের জল ফেলতেন। আর তাঁর স্বদেশের সাধারণ মানুষের দুরবস্থার বা বৈষম্যের মূল কারণ ছিল শিক্ষার অভাব। তিনি তখন উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইউরোপের মতো দেশে শিক্ষার ফলে মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়েছিল এবং আত্মবিশ্বাসের ফলেই ঐসব দেশবাসীর মধ্যে সুপ্ত ব্রহ্ম জেগে উঠেছিল। তিনি মানবিক শিক্ষা, সততা, চরিত্র ও প্রকৃত ধর্মবোধের উপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ তার প্রকৃতির প্রেরণায়

আপন প্রয়োজন পূরণ করার প্রয়োজন অনুভব করবে তখনই যখন মানবসমাজে যথার্থ মানবতাবোধের বিস্তার হবে। তিনি সাধারণ মানুষের শিক্ষণ প্রসঙ্গে বিষয়বস্তু ও মাধ্যমের কথা বলেছেন। শিক্ষালাভে সাহায্য করা এটা প্রাচীন ভারতে মহৎ ধর্ম ছিল। আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা দুই প্রথার বিদ্যাশিক্ষারই আয়োজন করা হতো। আর, গণশিক্ষা প্রসঙ্গে পরাবিদ্যার প্রয়োজন আছে। ভারতের তপোবনশ্রমে নানা গ্রন্থে যে রত্নরাজি লুকিয়ে আছে সেগুলোও সাধারণের গোচরে আনতে হবে। অর্থাৎ উপনিষদের মৌলিক কথাগুলো লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত জনগণের গোচরীভূত করতে হবে। ভারতের প্রতিটি মানুষকে জানতে হবে যে, উপনিষদের মহান বাণী– 'আমিই আত্মা, তরবারি আমাকে ছিন্ন করতে পারে না, অস্ত্র আমাকে ছিন্ন করতে পারে না, অগ্নি আমাকে দগ্ধ করতে পারে না, বায়ু আমাকে শুষ্ক করতে পারে না, আমিই সর্বশক্তিমান, আমিই সর্বজ্ঞ' (হালদার, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৯)। তবে উপনিষদের বাণী জনসাধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও তা সংস্কৃত ভাষায় হওয়ার কারণে জনসাধারণের পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভব হয় না। এজন্য স্বামীজী উপনিষদ সংস্কৃত ভাষায় হওয়ার পাশাপাশি মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রচারের কথা বলেন। কারণ সংস্কৃত ভাষায় যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে আছে মর্যাদা, আছে শক্তি। তাই সংস্কৃত চর্চা জাতিকে শক্তি ও মর্যাবোধে সমৃদ্ধ করতে পারে। তিনি গণশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার কথা বললেও সংস্কৃত চর্চার উপর গুরুত্ব দেন। কারণ এই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই উপনিষদের বাণীগুলো জনগণের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। দরিদ্রের কথা বলতে গিয়েও স্বামীজী বলেন যে, জনসাধারণের দরিদ্রই সমুদয় দুর্দশার মূল। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষার উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি বলেন-যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণ প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত (বিবেকানন্দ, ২০১৪, পৃ. ১১৬)। তিনি ভারতবর্ষের সর্বনাশের মূল কারণ হিসেবে মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে রাজশাসন, দম্ভবল ও বিদ্যাবুদ্ধি আবদ্ধ থাকাকে বুঝিয়েছেন। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য তিনি সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করার কথা বলেছেন। আর জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার বা শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব যারা ভুলে গিয়েছে তাদের মধ্যে লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ ফিরে পাওয়ার জন্য শিক্ষা গ্রহণের কথা বলেছিলেন। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্বল ও সবলের মধ্যে বলেন যে, বলবান অপেক্ষা সবলকে বেশি সুবিধা দিতে হবে। অর্থাৎ তেলা মাথায় তেল না দিয়ে বরং সাধারণ জনগণের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। জনশিক্ষার কথা বলতে গিয়ে তিনি ভারতের যে-কোন সংস্কার বা উন্নতির মূল হিসেবে ধর্মের উন্নতি আবশ্যক মনে করেছেন। কারণ ধর্মের উন্নতি হলে নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশীল ও পরহিতব্রত শিক্ষা পাওয়া সম্ভব। তাঁর মতে, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আমাদের উচিত হবে চরিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তি উভয়েরই উৎকর্ষসাধনের জন্য শিক্ষা বিস্তার। আর ঐ শিক্ষার ফলে তাহারা আত্মনির্ভরশীল ও মিতব্যয়ী হইতে পারে (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১৩৭১, পৃ. ৩৭১)। দরিদ্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রুতির দ্বারা শিক্ষাগ্রহণকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ তখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী এখনও বিদ্যালয় বা স্কুলের সময় আসেনি বরং তখন ছবি বাণিজ্য ও শিল্পাদির বিষয়ে শেখানো হবে বলে কর্মশালা খোলার কথা বলা হয়। তবে ঐসময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যদি তখন অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনে সক্ষম হতো তবুও দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েরা স্কুলে পড়তে আসবে না বরং তখন তারা জীবিকার্জনের জন্য হালচাষ করতে বের হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তিনি বলেন যে, আমাদের না আছে প্রচুর অর্থ-না আছে এদের শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য করার ক্ষমতা। কিন্তু এর মধ্যেও একটা পথ বের করতে হবে। দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছাতে না পারে (অর্থাৎ নিজেরা শিক্ষালাভে তৎপর না হয়), তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে যেতে হবে' (বাণী ও রচনা, ১৩৭১, পৃ. ৪৩৬)। গরিবের ছেলেরা যদি স্কুলে এসে লেখাপড়া শিখতে না পারে, তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের শিখাতে হবে। গরিবেরা এত গরিব, তারা স্কুলে পাঠশালে আসতে পারে না, আর কবিতা-ফবিতা পড়ে তাদের কোন উপকার নাই (বাণী ও রচনা, পৃ. ৪১২)। এক্ষেত্রে তিনি শিক্ষিতদেরকে সন্ন্যাসীবেশে গাছের তলায় বা অন্য কোথাও সমবেত হয়ে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা দিতে বলেছেন। তিনি

বলেছেন, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবলতা, দুর্বলতা বিচার না করে প্রত্যেক নর-নারী ও বালক-বালিকাকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং যতদিন পর্যন্ত নিজ লক্ষ্যে না পৌঁছানো যাবে ততদিন পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যাবে না যে লক্ষ্য পূরণ হয়েছে।

উপসংহার

শিক্ষা বিষয়ক চিন্তায় স্বামীজী মনুষ্যত্বের শিক্ষার উপর জোর দিয়ে যোগ্য শিক্ষকদের পাশাপাশি যুবকদের উপর আস্থা রেখেছিলেন। তাঁর মতে, শিক্ষা পরিপূর্ণতার এমন এক প্রকাশ যা মানুষের মধ্যেই থাকে। তাছাড়াও নারীশিক্ষার মাধ্যমে নারী মুক্তি ও জনশিক্ষা বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল সুদূরপ্রসারী। তিনি বারবার বাংলার দারিদ্র্য জনগণকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য শিক্ষা গ্রহণের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি তাঁর কর্মময় জীবনে শিক্ষা সম্পর্কে বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য ও মন্তব্য করেছিলেন। তাইতো শিক্ষার সংজ্ঞায় তিনি বলেছেন যে, মননশীল চিন্তায় গভীরতার কথা। বিজ্ঞানের বিশেষ স্থান প্রাপ্তির কথাও তিনি তাঁর শিক্ষাদর্শনে বলেছেন। অর্থাৎ বিবেকানন্দ শরীরচর্চা, ধর্ম, প্রযুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞান, চারুকলা, সাহিত্যসহ সবধরনের পাঠ ও চর্চাকে শিক্ষার অংশ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। এছাড়াও তিনি শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান প্রসঙ্গে ছাত্রজীবনে শিক্ষকের সান্নিধ্য ও প্রভাবের কথাও স্বীকার করেছেন। তিনি সম্প্রীতির আদর্শ হিসেবে ধর্মকে শ্রেষ্ঠ নিয়ামক মনে করেছেন। তিনি তাঁর কর্মময় জীবনে পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর না করে বরং সবকিছু বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অর্জন করে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এজন্য বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে স্বামীজীর নির্দেশিত পথ যথেষ্ঠ গুরুত্ববহ। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা কর' –তাঁর বিখ্যাত একটি উক্তি, যা দ্বারা দেশের লোকের মুক্তি সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করতেন। নারীশিক্ষার জন্য বিবেকানন্দ ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র, সংস্কৃত ভাষা, সেলাইয়ের কাজ, হাতের কাজ ও গৃহ পরিচর্যার কাজকে পাঠক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছিলেন। শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে স্বামীজী একাগ্রতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে, সাধারণ জনগণকে সুশিক্ষিত করতে না পারলে সমাজের অগ্রগতি কখনোই সম্ভব নয়।

টীকা

১। স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসপূর্ব নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত।আর বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাস নাম। বাবা-মা তাঁর নাম বীরেশ্বর রাখলেও "বিলে" বলে আদর করে ডাকতেন। আধুনিক ভারতের একজন সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতার এক উচ্চ ক্ষত্রিয় পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা বিশ্বনাথ ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের একজন স্বনামধন্য আইনজীবী এবং মাতা ভুবেনশ্বরী দেবী খুবই বুদ্ধিমতী এবং দেবদেবী ভক্তিপরায়ণা ছিলেন। বালক নরেন্দ্রনাথ মায়ের প্রভাবেই ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই খুব দুরন্ত প্রকৃতির নরেন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল অসাধারণ তেজস্বিতা মেধা, স্বাধীনচেতা মনোভাব, সাহস, বন্ধুপ্রীতি ও প্রবল আধ্যাত্মিকতা। ১৮৮৪ সালে তিনি ধীসম্পন্ন শিক্ষার্থী হিসেবে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৮৮৫ সালে তিনি অস্তিত্বের একত্বের অনুভূতি লাভ করেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে, যার মধ্য দিয়ে তাঁর দীক্ষার সমাপ্তি ঘটে।(সিরাজুল ইসলাম, সম্পাদক, বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-১০, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩১৭) ।

উল্লেখপঞ্জি

অমৃতত্বানন্দ, স্বামী, (১৯৮১). বিবেকানন্দ চরিত. দিনাজপুর: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন

ইসলাম, আমিনুল, (২০১১). বাঙ্গলীর দর্শন প্রাচীনকাল থেকে সমকাল. মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার: ঢাকা

জ্ঞানদ্বীপ, (১৯৯৭). রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা

ঘোষ, সুধাংশুরঞ্জন, (১৪২০). বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, কামিনী প্রকাশনালয়, কলকাতা

দাশগুপ্ত, শ্রীমৃণালকান্তি, (১৯৯৬), মুক্তপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, কলকাতা

দেব, মিলটন কুমার,(২০১৭), স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা, মাধবী রাণী চন্দ্র (সম্পা), প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা, ৭ম সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

দেব, মিলটন কুমার ও রেবেকা সুলতানা, (২০২০). জয়তু বিবেকানন্দ, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা

বিবেকানন্দ, স্বামী, (২০১৪). শিক্ষা প্রসঙ্গ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়

বিবেকানন্দ, স্বামী, (২০২২). ভারতীয় নারী, কলকাতা, বাগবাজার, উদ্বোধন কার্যালয়

বিশ্বশ্রয়ানন্দ, স্বামী, (১৯৯১). স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মঠঃ ঢাকা

রায়, সুশীল, (১৯৮৯). শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, কলকাতা

লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী, (১৯৯৬). চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, কলকাতাঃ রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার

সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার (১৪২০). পরমপুরুষ শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ. কলকাতা

সনাতনন্দ, স্বামী, (১৪০৯). শিক্ষা ও শিক্ষক. সূর্য পাবলিশার্সঃ কলকাতা

হালদার, গৌরদাস, (১৯৯৩). শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ব পাঠক্রমচর্চা, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলেজ রোড, কলকাতা

সাক্ষাৎকার, স্বামী অম্বেশানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন, মতিঝিল, ঢাকা. ১৩.১২.২০২৩.